প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে মাটি-ঘেষা মানুষের জীবন সংগ্রাম

নীতিশ দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয়, মার্ঘেরিটা, তিনসুকিয়া, আসাম, ভারত

Abstract
Sadhan Chatterjee is the most celebrated writer of short stories-fiction. Although he is in the teaching profession yet he is devoted to literary skills. He is, in fact, one of the most renown in the literary field of the times having contributed to it, even today. In his fiction, he focuses his attention to the village life, Cosmo-metropolitan life in which the innocent suffer from the bad matrix of socio-political upheavals. Most of all, he dwells on the growth of the Panchayet-politics to the spiraling into the over powering of political-lust.
In modern literature, Sadhan Chatterjee has carved a prominent position in his writings. His contribution to modern fiction is invariably thought-provoking and in-depth. In 'Gohin Gang', he has delved in the populace of the Sunderbans, in the deserted jungles and river along with the struggle of living amongst the habitat and the people out there. For this, he also kept in touch with them, so as to be in the down-to-earth manner and then he could display characterize them as living characters in his fiction as such. In modern era, as we term as 'subaltern' – can be coined and analyzed in Sadhan Chatterjee's writings.
***Keywords**: Village life, Cosmo-metropolitan life, Panchayet-politics, Political-lust, Down-to-earth, Subaltern.*

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম অবিভক্ত ভারতে ১৯৪৪ সালের ১৮ জানুয়ারি। জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার শোলনা গ্রামে। পিতা রমণীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা বিরজাবালা দেবী। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদত্ত নাম চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। তিনি পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হয়েও সাহিত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগে সাহিত্য চর্চাকে জীবনের লক্ষ হিসেবে নির্ধারণ করেন।

সাধন চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম খ্যাতনামা শিল্পী। শিক্ষকতার মাধ্যমেই তার কর্মজীবনের সূত্রপাত। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে তিনি আর্বিভূত হন এবং সমগ্রজীবন ধরে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়ে সেই ধারাকে আজও অব্যাহত রেখে চলেছেন। ছোটগল্পের প্রতি তার ঝোঁক বেশি ছিল। জীবনের প্রথমদিকে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী না থাকলেও পরবর্তী অধ্যায়ে তার শূন্যতা পূর্ণ করেন। সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হবার পূর্বে তার প্রস্তুতি সম্পর্কে লেখক নিজেই মন্তব্য করেছেন, "১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া এবং হঠাৎই সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। এর আগে সাহিত্য নিয়ে আদৌ কোনো ভাবনা চিন্তা ছিল না। বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' পাঠ করে মনে হয়েছিল এসব লেখা 'আমিও পারি'।"[১] এই 'আমিও পারি' প্রবণতা লেখককে সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছাতে ইন্ধন যুগিয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' গ্রন্থটি সাধনকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। শুধু ছোটগল্প বললে ভুল হবে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি সব্যসাচীর মতো অস্ত্রধারণ করে অগ্রসর হয়েছেন। তার রচনায় উঠে এসেছে গ্রাম বাংলার দৃশ্য, শহর-নগরকেন্দ্রিক জনজীবনে রাজনীতির নাগপাশে আবদ্ধ নিরিহ মানুষের আর্তনাদ। পঞ্চায়েতের রাজনীতিকে অস্ত্র বানিয়ে মুষ্ঠিমেয় মানুষ কিভাবে ক্ষমতার শিখরে চলে আসে তার প্রতিফলন সাধনের রচনার মধ্যে দেখা যায়। যদিও বামপন্থী রাজনীতির ছোঁয়াচে রোগ থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রান্ত হতে পারেননি বা হতে প্রয়াসী হননি। তার মতে, "বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রভাবের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব এবং ব্যক্তিভাবনার বিভিন্ন বাঁক-বাঁকান্তর ধরে নিয়ত আত্মবীক্ষণ পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের প্রক্রিয়ায় প্রায় তিন দশক ধরে সাহিত্য সাধনা।"[২]

এ পর্যন্ত তিনি প্রায় তিন শতাধিকের অধিক গল্প রচনা করেন। তিনি প্রধানত লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক হলেও তার কোনো সংকোচ ছিল না। সাহিত্যকৃতির মাধ্যমেই লিটিল ম্যাগাজিনের পরিবর্তন সাধন করতে চেয়েছিলেন। তার রচিত প্রথম

গল্প 'বন্যা' ১৯৬৬ সালে 'নন্দন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছোটগল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তার 'অগ্নিদগ্ধ' উপন্যাসটি। তারপর ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'মনোনয়ন'। তিনি শুধু গল্প উপন্যাস রচনা করে ক্ষান্ত হননি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন সমাজ রাজনীতি সাহিত্য-বিষয়ক নানা ধরণের প্রবন্ধ। প্রেরণাময় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাংলা সাহিত্যের যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথকেই শিরোধার্য করে সাহিত্যের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন।

সাহিত্যকে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখতে চাননি লেখক। যারা সাহিত্যকে বিনোদন হিসেবে দেখেন, তাদের সঙ্গে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় সাধনের। লেখক নিজেই জানিয়েছেন, "আমি নিছক বিনোদনের জন্য লিখি না বা সময়ের সাথে তাল রেখে পাঠক যা খায়, গল্প উপন্যাসে বিতরণ করতে অনাগ্রহ বোধ করি। আমি প্রতিটি ব্যক্তিজীবনের একটি পারপাস বা অর্থময়তায় বিশ্বাস করি। চলতি সমাজের নিক্তিতে সেসবের মূল্য কতটুকু, 'আধুনিক' পাঠকদের তা প্রয়োজন আছে কি না - এসব ভাবনাই সংগ্রহ প্রকাশে কুণ্ঠার কারণ ছিল আমার।"[৩]

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সাধন চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য আসন অধিকার করে আছেন। তার সাহিত্য সাধনার অন্যতম ফসল 'গহিন গাঙ' উপন্যাস-এ সুন্দরবনের 'অরণ্য নদী ও মানুষের জীবিকার সংগ্রাম'-এর ইতিহাস স্থান পেয়েছে। লেখক সুন্দরবন অঞ্চলের মাটিঘেষা মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্রকে প্রত্যক্ষ করে সাহিত্যের মধ্যে তাদের জীবন্ত করে তুলেছেন।

'গহিন গাঙ' উপন্যাসটি 'প্রান্তিক' শারদীয় সংখ্যায় ১৯৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তার পরের বছর ১৯৮০ সালে 'প্রান্তিক' প্রকাশনা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের বসবাসকারী মাটিঘেষা মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্রকে অত্যন্ত সহমর্মিতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। স্বল্পায়তন এই উপন্যাসের মধ্যে অরণ্য, নদী ও মানুষের জীবিকার সংগ্রামকে যে পরিভাষায় ব্যক্ত করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, "বিশেষ প্রয়োজনে সুন্দরবন অঞ্চলে কাটাতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন। প্রত্যক্ষ করেছিলাম অরণ্য, নদী ও মানুষের জীবিকার সংগ্রাম। প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পাশাপাশি ধর্ম, লোকাচার, স্বপ্ন ও বিশ্বাসের দোলাচলে যে মানুষ বাঘ, কুমীর-কামোট ও 'মনুষ্য-দাপট' বুকে নিয়ে নোনা গাঙ-এর 'গোন' 'বেগোন'-এর মতো, ইতিহাস তৈরি করছে-আধুনিকতা যাকে বলে সাব-অলটার্ন -এ উপন্যাস তাদের জীবনের কয়েকটা দিন। 'কয়েকটা দিন' -কিন্তু খণ্ডকালের আভাস। সমাজ-বিন্যাস বদলাচ্ছে। বদলাবার পথে সাহিত্য-ইতিহাস হয় জনজীবনের। গহিন গাঙ-এর উদ্দেশ্যও তাই।"[৪]

আধুনিককালে আমরা যাদের 'সাবলটার্ন' বলে চিহ্নিত করি তাদের জীবনসমস্যাকে উপন্যাসের আধেয় করে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তার লেখনীতে ফুটে উঠে জীবন-বীক্ষার পরিচয়। তাই হাল আমলের অনেক সমালোচকের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হন। যাই হউক আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে 'গহিন গাঙ' উপন্যাসে মাটিঘেষা মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্তবিদায়ক বর্ণনা। তিনি সুন্দরবন অঞ্চলের দীনহীন মাছমারাদের জীবনসমস্যার দিকে আলোকপাত করেছেন। স্বল্প পরিসরের এই উপন্যাসে বেতনা তীরবর্তী মালোসংস্কৃতিকে পুরোপুরি তুলে ধরতে প্রয়াসী হননি, তাই স্বভাবতই তিতাসের মালোপাড়ার সঙ্গে (তিতাস একটি নদীর নাম) বা কেতুপুরের মালোপাড়ার সঙ্গে (পদ্মানদীর মাঝি) বেতনার মালোসংস্কৃতির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। খুব কম সময়ে সম্পূর্ণ হওয়া এই উপন্যাসে অল্প কয়েকটি চরিত্রের মধ্যেও জীবনরস সঞ্চার করে মূল বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। চিত্রকর যেভাবে তুলি দিয়ে তার চিত্র সম্পূর্ণ করে সাধন চট্টোপাধ্যায়ও সেভাবে মানস তুলির সাহায্যে তার কাহিনি রচনা করেন। সমালোচকের মতে, "......তাঁর মানুষ ও ইতিহাসে আস্থা, মানুষের সংগ্রামে শ্রদ্ধা থেকে যায়। কিন্তু অন্ধকার-অবসন্নতা-জটিল ন যযৌ ন তস্থৌ গতিহীনতার চেতনাও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আর এ ক্ষেত্রে সাধন এক ঐতিহাসিক ও শ্রেণীভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এগোন। তিনি জানেন, শত মার খেলেও, অ-মধ্যবিত্ত নিম্নবর্গীয় শ্রেণী কখনোই তার বহিরাশ্রয়ী জীবন চেতনা, সংযোগ হারায় না।"[৫] উপন্যাসের শুরুতেই লেখক নিগৃহীত মাছ মারার ব্যর্থ জীবনকাহিনিকে তুলে ধরেছেন। তাদের মধ্যে খুব কম মানুষই বার্ধক্যের সিঁড়িতে পৌঁছানোর সুযোগ পায় -তার আগেই অপঘাত মৃত্যু এসে মালোদের গ্রাস করে। জীবনসংগ্রাম শুরু হবার আগেই জ্বলন্ত প্রদীপকে অপঘাত মৃত্যু যেন ফুৎকারে নিভিয়ে দেয়। উপন্যাসের নায়ক শ্রীপদই প্রথম অপঘাতের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে মালোপাড়ায় উপস্থিত হয়। তাদের জীবনও যে অর্নিবচনীয় যাত্রা। মালোজীবনে বসে খাওয়ার রীতি নেই, অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও মাছ মেরে জীবন নির্বাহ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে ললিত বর্মণ অপমৃত্যুর ডাককে এড়াতে পারেনি। একদিকে অরণ্যের ডাক অন্যদিকে খটিদার মহাজনদের দাদনের লোভ তার মধ্যে সুন্দরবনের বাঘের উপদ্রব -এভাবেই চলতে থাকে মালোদের জীবন চক্র। ললিতের অকালমৃত্যু ননীবালার জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। মালোজীবনে মৃত্যুর পালা এভাবে চলতে থাকে -মালোসমাজ তা মেনে নিতে বাধ্য কারণ তাদের মতে 'ভাগ্যে যা লেখা থাকে' তা খণ্ডানো মানুষের পক্ষে অসাধ্য। মৃত্যু সবসময় তাদের হাতছানি দেয়। তাই ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন, "মালোসমাজের অন্যনাম বিধবা পল্লী। মালোদের মধ্যে এমন কোনো পরিবার নেই, যাদের কোনো বউয়ের দেহে কালো পাড়ের থান ওঠেনি, শোকের শেল তোলেনি হাহাকার। এমন কোনো কুটির নেই যার বড় ছেলে অশৌচ পোষাকে খটিদার, মহাজনদের পায়ের তলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টার বদলে দু'দশ টাকার সাহায্য পেয়ে সুদের গভীর বন্ধনে জড়িয়ে পড়েনি।"[৬]

মালোপাড়ার মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এধরণের দুঃসংবাদের আশঙ্কায় দিন গুণতে থাকে। মালোরা কেবল এই দুঃসংবাদের জন্য জেগে থাকে, পরদিন থেকে আবার আগের মত জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয়। মালোরা বেতনার জল থেকে মাছ ধরে তা গঞ্জের খটিদারের কাছে বিক্রি করে, আর খটিদারেরা সে মাছ সংগ্রহ করে শেষ লঞ্চে ক্যানিং-এর মোকামে চালান দেয়। শহরের সঙ্গে

যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম লঞ্চ বন্ধ হয়ে গেলে খটিদারেরা মাছ কেনা বন্ধ করে দেয়। আর সেভাবে খটিদারেরা শাসকগোষ্টির সহায়তায় লঞ্চের ভয় দেখিয়ে জেলেদের শোষণ করতে থাকে। শুধু লঞ্চের ভয় দেখানো নয় খটিদার ও মহাজনের কুচক্রান্তে মালোরা কোনোদিন স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে না। তারা সুদী কারবার করে মালোদের ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখে। ঈশ্বর মেদিনীপুর থেকে কপর্দকহীন অবস্থায় বাদা অঞ্চলে এসে সুদের কারবারের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। তার কাছে ইহজীবনে একমাত্র আরাধ্য বস্তু হল টাকা। খটিদার আবদুলের সঙ্গে চোরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয় ঈশ্বর। মালোদের পক্ষে খটিদারদের চটানোর ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হয়। খটিদারদের সঙ্গে কো-অপারেটিভের বিরোধ হলে বিভিন্ন কৌশলে তারা লঞ্চ বন্ধ করে দেয়। শ্রীপদর পিতা ললিত একবার খটিদারদের সঙ্গে বিদ্রোহ করে কো-অপারেটিভে গিয়েছিল তার জন্য তাকে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। মহাজন ও খটিদারের কুচক্রান্তে মালোরা কোনোদিন মাথাতুলে দাঁড়াতে পারে না।

ললিতের মৃত্যুর পর সংসারের কর্তৃত্ব শ্রীপদকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। আবার অন্যদিকে মালোপরিবারের অনেকেই শ্রীপদর উপর রুষ্ট ছিলেন। ভদ্র সমাজনামধারী বাবুরা শ্রীপদর উপর অসন্তুষ্ট। মালোরা জানে দাদন, সুদ, সাহায্য, রিলিফ ছাড়া জীবন নির্বাহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। উচ্চবর্গের চাপানো আর্থিক কাঠামোর জটিল নাগপাশ থেকে বেরনো যায় না। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ললিত নিজের প্রচেষ্ঠায় কিছু জমি কিনেছিল। সে জানে গহিন গাঙের মাছের উপর সবসময় ভরসা করা যায় না। কিন্তু সে জমির উপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে নেকড়ের মত তাকিয়ে থাকে আবদুলের মত খটিদারেরা। আবদুল অনেক চেষ্ঠা করেও সে জমি আয়ত্ত করতে পারেনি। অন্যদিকে চিরাচরিত রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করে চলে শ্রীপদ, “সংস্কার মানতে চায় না, অলৌকিকত্ব তার বিশ্বাসে ঠাঁই পায় না, তাছাড়া বিগত বছরগুলোতে শ্রীপদকে নিয়ে মালোপাড়া কম ঝাক্কি পোয়ায়নি। গঞ্জের অনেক বাবু আজ মালোপাড়ার উপর অসন্তুষ্ট। দয়াল জানে দাদন, সুদ, সাহায্য, রিলিফ এ-গুলো ছাড়া মালোপাড়া বাঁচেনি, বাঁচবেও না। শ্রীপদ সেই বাঁধনগুলোতেই আঘাত হেনে, সমাজটাকে সর্বনাশের পথে বসাতে চেয়েছিল।”[৭]

ললিতের মৃত্যুর পরই শ্রীপদ সিদ্ধান্ত নেয় যে আর কখনও জঙ্গলে যাবে না। যেখানে মৃত্যু সবসময় ফাঁদ পেতে বসে থাকে। জীবনযুদ্ধে তারা সেই অপমৃত্যুর ডাক এড়ানোর অব্যর্থ প্রয়াস করতে থাকে। মালোসমাজে বসে খাবার রীতি নেই, তাই বাঁচার তাগিদে তাদের মাছ মারতেই হয়। শ্রীপদর জীবনচক্র একই ধারায় ঘুরতে থাকে। নৌকা ও জালের মালিক আবদুল, তাই তার কবল থেকে বেরিয়ে আসা শ্রীপদর পক্ষে দুঃসাধ্য। তথাপি চেষ্ঠার ত্রুটি নেই, শ্রীপদর ইচ্ছে ছিল জালে যা মাছ আসে তা কো-অপারেটিভে বিক্রি করবে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই -আবদুলকে অমান্য করলে জীবন যে দুর্বিষহ হয়ে উঠবে তা হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেয়েছে সে।

জীবনে চলার পথে বৃদ্ধদের পরামর্শ অত্যন্ত আবশ্যকীয়। আর দয়াল মালোপাড়ার প্রাচীন ব্যক্তিদের অন্যতম। এককালে সে মালোপাড়ার নামজাদা ‘সাঁইদার’ ছিল। এখন বৃদ্ধ দয়ালের গলায় তুলসীর মালা, মাথার চুল সাদা, গায়ের চামড়া কুঁচকানো। তার উপরি সে একটু রাতকানা। মালোপাড়ার নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন তার একান্ত কাম্য। চোখের সামনে মালোপাড়াটা দিন দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে তা তার পক্ষে সহনাতীত। ললিতের ‘কুশপুত্তুর’ পোড়ানোর প্রস্তাবে সে বলেছিল ‘ভেবে কাজ কইরো, কইরে ভেবো না। বুড়ো মানুষটার কথা ফেলে দিও না।’ যদিও সে কিংবদন্তীর নায়ক কিন্তু বর্তমানে খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড় সংগ্রাম। এই বৃদ্ধ বয়সেও বিনজাল নিয়ে বেতনার বুকে মাছ ধরতে যেতে হয়। বছর দুয়েক হল বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ঘরে বসে নামকীর্তন করে। জীবন অধ্যায়ের অন্তিম পর্বে একটু শান্তি চায় এই নামকীর্তনের মধ্যে।

শ্রীপদর দুর্দিনের একমাত্র আশ্রয়স্থল ডাক্তারবাবু। মালোরা জানে খটিদারের কাছে মাছ বিক্রি করলে তারা উপযুক্ত মূল্য পায় না। খটিদারেরা নৌকা ও জালের মালিক হিসেবে মালোদের ঠকানো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মালোরা কো-অপারেটিভের সুযোগ সুবিধে গ্রহণ করতে অনেকে আসে, কিন্তু এখানে আসার পরিণামও ভয়ানক হয়। আর অন্যদিকে তারা চড়া দাদনেই খটিদারদের কাছে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে থাকে। রাজনৈতিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ডাক্তারবাবু শ্রীপদকে সাবধান করে বলেছিলেন, “শ্রীপদ, তোমরা কিন্তু ঘোড়াটা জোরেই ছোটাচ্ছ, গাড়ি উল্টে যাবার ভয় আছে। তোমার বেতনার চেয়েও এ গাঙ কিন্তু গহিন।’ আঙ্গুল উঁচিয়ে গঞ্জের এই সমাজটাকে নির্দেশ করেছিলেন সেদিন। শ্রীপদ সেদিন তর্ক করেনি, হেসে জবাব দিয়েছিল, ‘আপনার ঐ আলুনি পান্তা আর পেটে রোচে না আমার। ......কো-অপারেটিভে কি দেশটা পাল্টে যাবে?”[৮]

জঙ্গলে আপনজনকে সঁপে দিয়ে কুশপুত্তুর পোড়ানোর দীর্ঘকালগত রীতি আছে মালো সমাজে। তাদের রীতি অনুসারে, যে গরীব মানুষের অপঘাতে মৃত্যুর পর বাড়ির মানুষের অশৌচ পালনের ক্ষমতা থাকে না, তারা অপেক্ষা করে থাকে, যখন পয়সা জোটে তখন খড় বা কলাগাছ নিয়ে মৃত মানুষটির কুশপুত্তুর বানিয়ে নদীর চড়ায় পুড়িয়ে একমাস অশৌচ পালন করে। সে অনুষ্ঠানে কম করেও হাজার টাকা লাগে আর সেভাবেই সুদের গভীর বন্ধনে তারা জড়িয়ে পড়ে। সুদ ও তস্য সুদ বারবার মালোদের মনে করিয়ে দেয় লোকটা মরল, সঙ্গে মেরে গেল গোটা পরিবারকে। সুদের মায়াজাল থেকে রক্ষা পাবার জন্য চিরাচরিত সংস্কার ও অভ্যাসের বিপরীতে গিয়ে দাঁড়ায় শ্রীপদ।

আমাদের সমাজে প্রচলিত চিরাচরিত যে প্রবাদ ‘দুঃখের পর সুখ আসে’ তা মালোদের ক্ষেত্রে মানায় না। কারণ তারা ইহজীবনে সুখের মুখ কোনোদিনই দেখতে পায় না। জীবনের এই দুর্দিনে শ্রীপদর ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রপ্রাপ্তির আনন্দে সে যেন বাতাসে ভাসতে থাকে। ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শ্রীপদ কো-অপারেটিভে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ সেখানে মাছ বিক্রি করলে তাদের মুনাফা বেশি হয়। কিন্তু সেখানে যাবার পরিণামও ভয়ানক হয়। ললিতও খটিদারের সঙ্গে বিদ্রোহ করে কো-অপারেটিভে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে যাবার শখ আবদুল কড়ায় গণ্ডায় উসুল করেছে।

আসলে খটিদার মহাজন সবই সমগোত্রীয়, আসল চেহারা সবার প্রায় একই। ললিত বিপদের সময় তাদের কাছ থেকে টাকা ধার এনেছিল এবং কয়েক কিস্তিতে তা শোধও করেছিল কিন্তু তার মৃত্যুর পর হঠাৎ জানা যায় তিন বছর আগে ধার করা পঞ্চাশ টাকা বর্তমানে সুদে আসলে মিলে দুশো পয়তাল্লিশ টাকা হয়েছে। সমাজের সর্বত্র শোষকের চেহারা প্রায় এক। পরম বৈষ্ণব কিশোরীপাল ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নিরিহ মানুষদের কাছে দ্বিগুণ দামে খড় বিক্রি করে। ললিতের ব্যর্থ প্রচেষ্ঠাকে সার্থক করে তুলতে চেষ্ঠা করেছিল শ্রীপদ। সমালোচকের মতে, "ললিতের অসমাপ্ত লড়াই আবার শুরু করতে চায় 'নতুন যোবক' শ্রীপদ, যে উত্তর প্রজন্মের প্রতিভূ। দয়ালের সঙ্গে তার মতবিরোধকে লেখক কেবল দুই প্রজন্মের দূরত্ব হিসেবেই দেখেন না, দেখেন জীবন প্রত্যয়ের, অর্থাৎ জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের নিরিখে। কিন্তু উপন্যাসের দ্রুত লয়ের ঘটনাপ্রবাহে দেখি, অচিরেই শ্রীপদ আক্রান্ত হয়েছে, এবং তার প্রতিষ্ঠাসন্ধানী অভীপ্সা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ললিতের পুত্র, তারই ছোটভাই লগাই দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে; খটিদার আব্দুলের খুটি হয়ে উঠেছে সে।"[৯]

শ্রীপদ যদিও ললিতের কুশপুত্তুর পোড়ায়নি কিন্তু নবজাতকের ছয়ষষ্ঠীর জন্য তাকে ভাবতে হয়। এই ছয়ষষ্ঠীর রাতেই ভাগ্যদেবী ছেলের ললাটে সমস্ত জীবনের শুভ-অশুভের বিধান লিখে দিবেন। শ্রীপদ অবশ্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরে বড়ঠাকুরের পূজো হবে, পাড়ার এয়োরা ব্রত পড়বে, প্রসাদ খাবে সবাই। কিন্তু তার জন্য চাই টাকা। অনেক ভেবে চিন্তে শ্রীপদ আবার বেতনায় বিনজাল নিয়ে মাছ মারতে যায়, সেদিন তার ভাগ্যও ভালো ছিল তাই অল্পসময়ের মধ্যেই বেশ কিছু বাগ্দা চিংড়ি জালে ধরা পড়ে। কিন্তু খটিদার আবদুল 'বিকেলে হিসেব হবে' বলে সব মাছ করায়ত্ত করে। অনন্যোপায় হয়ে বউয়ের নাকের নোলক ত্রৈলক্য স্যাকরার দোকানে বন্ধক রেখে দু'শ ত্রিশ টাকা নিয়ে আসে এবং সে টাকায় শ্রীপদ গঞ্জ থেকে দোকানহাট করে বাড়ি ফেরে। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে তারা যেন জীবনের স্বাদ খুঁজে পায়, আত্মতৃপ্তি পায়। এই মাটিঘেষা জেলে মাঝিরা একত্রিত হয়ে ব্রতপাঠ আর পূজা অর্চনা করে নবজাতকের শুভ কামনায়। কিন্তু এই শুভ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য অযাচিত অতিথি হিসেবে ঈশ্বরকে সঙ্গে করে আবদুল এসে হাজির হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবদুল নিজের অভিপ্রায় জানিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। শ্রীপদর অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন,-"এ শিশুর এই ভাগ্যেই দিনটির সমাপ্তি ঘটে। কীর্তন হয় না, যে যার ফিরে গেল বাড়ি। ননীবালা তখন পাথরের মতো বসা। শ্রীপদ হাঁটুতে মাথা গুঁজে। যেন ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। খাড়ির মুখে পাটা জাল ঘিরে যেমন মাছমারারা মাছ তোলে, সেও যেন অদৃশ্য জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। শিশুটি কেঁদে উঠল। পদর বুক ফালা ফালা। নিঃশ্বাস বেরুল। সে কী ভাবছে? শিশু ঈশ্বরের পুত্র, কোনো মন্দ ভাগ্য নিয়ে আসতে পারে না। সব কিছু বুক পেতে নিতে হবে পদকেই। ও যে পিতা। পুত্রকে ফেলে সে জঙ্গলে যাবে না। পৃথিবীর পতঙ্গেরও স্বাধীনতা আছে, ওদের থাকবে না কেন।"[১০]

শ্রীপদর এই দুঃসময়ে কাল হয়ে দাঁড়ায় তার সহোদর লগাই। লগাই আবদুলের কুচক্রান্তে সঙ্গী হয়ে শ্রীপদকে আঘাত করার জন্য পিতার মৃত্যু নিয়ে থানায় এফ আই আর করে বসে। আর অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঘটনায় শ্রীপদকে জড়ানো হয়। এত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করার ক্ষমতা শ্রীপদর ছিল না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ঘটনা মুখরোচক সংবাদ হয়ে গ্রামে-শহরে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাকশন। থানার বড়বাবু পদকে থানায় তলব করলেন। সহোদর ভাইয়ের অভাবনীয় কাণ্ডে শ্রীপদ আজ দিশেহারা। কি করবে, কি না করবে -চোখের সামনে সমস্তই অন্ধকার। এই বিপদে যিনি রক্ষা করতে পারেন তিনি হলেন ডাক্তারবাবু। দীর্ঘদিনের পোড়-খাওয়া, বাদায় চুল পাকানো ডাক্তারবাবু কিন্তু কোনো আশ্বাস দিতে পারলেন না। এখানে মানুষ স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না, মন যা চায় তা করারও কোনো উপায় নেই -কারণ এখানে শাসক, খটিদার, আইন-আদালত, রাজনৈতিক দলের নেতা সবই যেন শোষকের ভূমিকা নেয়। আর নিরিহ, অসহায়, নিপীড়িত মানুষ জীবন সংগ্রামে যুদ্ধ করা দূরে থাক সারাজীবন বশ্যতা স্বীকার করে চলে। নাম পরিচয়হীন মানুষ এভাবেই মৃত্যুর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে শরবিদ্ধ পাখির মতো মৃত্যুকেই কামনা করে। শ্রীপদর মনে আশঙ্কা ছিল ললিতের মত তারও যদি অপঘাত মৃত্যু হয় তা হলে হয়তো কড়ির স্থান হবে নদীর তীরের দরমার ব্যারাকে আর ননীবালাকে ভিক্ষে করে জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

শিকারিরা যেভাবে চারা দিয়ে ফাঁদ পেতে বসে আবদুলও সেভাবে শহরের লোভনীয় চটক দেখিয়ে লগাইকে করায়ত্ত করে। আর লগাইর মনে আশা ছিল আবদুলের দৌলতে ক্যানিং-এর সেচ-অফিসে চাকুরি করতে পাবে। খটিদারের মোহজালে বন্দী হয়ে সহোদরের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করে। এমনকি মিয়াসাহেবের অভিসন্ধি সম্পর্কে লগাইর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি। একদিকে চাকুরির আশা, শহরের লোভনীয় চটক, টাকার লোভ ও অন্যদিকে আলতার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি -সব মিলে লগাই মোহান্ধ হয়ে নিজেই যেন আবদুলের ফাঁদে ধরা দেয়। আবদুলও টাকা দিতে পিছুপা হয় না।

শ্রীপদর অবস্থা শরবিদ্ধ পাখির মতো। ললিতের বাঘের পেটে অপঘাত মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীপদকে জেলের ভয় দেখানোর মধ্যে আবদুলের অঙ্গুলি চালনাই কাজ করে। আসলে তার যে চাষের জমি ছিল তাকে দখল করার জন্যই আবদুলের এই ষড়যন্ত্র। থানার বড়বাবুও মধু আর হারানের কথায় বিশ্বাস করেননি, তার সাক্ষী হিসেবে গুণীন শেখকে চাই। গুণীন শেখের সন্ধান নেই, ডাক্তারবাবু কোনো আশ্বাস দিতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে স্ত্রীর কাছে জঙ্গলে যাবার প্রস্তাব করে শ্রীপদ। কড়ি প্রস্তাব শোনামাত্রই চমকে উঠে, যেখানে মৃত্যু সবসময় ওঁৎ পেতে বসে থাকে। সে খোকার দিব্যি দিয়ে স্বামীকে ধরে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস করে। মালোদের ঘরে বসে থাকার কোনো রীতি নেই সমাজে। জঙ্গলে না গিয়ে থাকতে পারে না। চোখের সামনে সমস্তই অন্ধকার তথাপি তাকে যেতেই হবে। ঔপন্যাসিক শ্রীপদর অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "বড় নদীর জল ফুলছে, ফুঁশে উঠছে; ধীরে ধীরে আকাশচুম্বী জলস্তম্ভ ভেঙে ভেঙে একটা মূর্তি বেরিয়ে আসছে, যার লাল চোখজোড়া চোয়াল পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, কষার দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে দাঁত। পদ যেন ভয়ে ভয়ে চেঁচাচ্ছে, 'হেই, তুই আমার বাপ

নস। দানো!' মূর্তিটা লোমশ হাত নাড়ছে, 'বাপ! বাপ-রে! আসিসনি সর্বনাশীর কাছে।' জলস্তম্ভ ভেঙে ভেঙে পড়ে, ঢেউ কমে আসে, পদর চোখের সামনে বেতনা জল ঠেলে নিয়ে যায় সাগরে।"[১১] এই সেই দক্ষিণ যেখান থেকে ফিরে আসা যায় না। যে শ্রীপদ 'নতুন যোবক', যে 'সংস্কার মানতে চায় না', 'অলৌকিকত্বে' যার বিশ্বাস নেই, যে ললিতের 'কুশপুত্তুর' দাহ করেনি সে-ই শেষপর্যন্ত নিজের 'কুশপুত্তুর' নিজেই দাহ করে। কারণ কোনোদিন যদি দক্ষিণ থেকে ফিরে না আসে তখন পুত্রকে 'কুশপুত্তুর' পোড়ানোর ভয় দেখিয়ে ঋণের জালে গাঁথতে পারবে না।

উপন্যাসের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নায়কের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃতি যেন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বাতাস, বৃষ্টি ও মেঘে সমস্ত বেতনা যেন ফুলে উঠছে। তথাপি জীবন সংগ্রামে শ্রীপদকে দক্ষিণে যেতেই হবে। কিংবদন্তীর নায়ক দয়াল এসেও তাকে কোনো ভরসা দিতে পারেনি। শুধু অদৃষ্টের নামে দোহাই দিয়ে নিজের ভাগ্যকেই দোষারূপ করে। আসলে নিম্নবর্গের এই নিরিহ মানুষেরা কোনোদিন উচ্চবর্গের চাপানো আধিপত্য থেকে মুক্তি পায় না। জীবন সংগ্রামে এভাবেই যুদ্ধ করে শেষমেষ বশ্যতা স্বীকার করে চলে।

সবকিছু পিছনে ফেলে শ্রীপদর নৌকা দক্ষিণে চলে। বেতনা হয়ে ধীরে ধীরে ভয়াল অরণ্যের দিকে ছুটে চলে নৌকা। ঝড়-জল মাথায় নিয়ে, বুকভরা বেদনা নিয়ে বনবিবির সাম্রাজ্যে শিকার করতে গেলেও মালোদের মন সবসময় পড়ে থাকে ঘরের মধ্যে। এভাবেই তাদের জীবন শুরু হয়, আর এভাবেই সমাপ্তি, মধ্যে শুধু মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট।

পরিশেষে বলতে পারি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস ধারার সূত্রপাত করেন সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে সাধন চট্টোপাধ্যায় ১৯৮০ সালে প্রকাশ করেন 'গহিন গাঙ' উপন্যাস। আলোচ্য উপন্যাসে সুন্দরবন অঞ্চলের নদী অন্বিত সমাজের ছবিকেই লেখক সহমর্মিতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। আধিপত্যবাদী সমাজব্যবস্থায় দারিদ্র্য লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মালোদের জীবন সংগ্রাম ও সমকালীন সমাজ বাস্তবতার যে ছবি এঁকেছেন তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

সূত্র নির্দেশ :

১। সামন্ত, সুবল (সম্পাদনা), 'বাংলা উপন্যাসঃ বীক্ষা ও অন্বীক্ষা' ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ.২৬৭

২। সামন্ত, সুবল (সম্পাদনা), 'বাংলা উপন্যাসঃ বীক্ষা ও অন্বীক্ষা' ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, কলকাতা, পৃ.২৬৭

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, (প্রধান সম্পাদক), 'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ ১' প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা বইমেলা ১৯৯৫, দিবারাত্রির কাব্য, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৭৪৩৩৩০, পৃ.১০

৪। চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'গহিন গাঙ', ১৯৯৬ বইমেলা, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ.৭

৫। 'সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পঃ একজন পাঠক' রচনায় পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পৃ.১৭

৬। চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'গহিন গাঙ', ১৯৯৬ বইমেলা, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ.১৯

৭। চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'গহিন গাঙ', ১৯৯৬ বইমেলা, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ.২৭

৮। চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'গহিন গাঙ', ১৯৯৬ বইমেলা, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ.৩৭

৯। ভট্টাচার্য, দেবাশিস, 'বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা' প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১০, অক্ষর পাবলিকেশনস্‌, ত্রিপুরা-৭৯৯০০১, পৃ.৩২১

১০। চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'গহিন গাঙ', ১৯৯৬ বইমেলা, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ.৫৪

১১। চট্টোপাধ্যায়, সাধন, 'গহিন গাঙ', ১৯৯৬ বইমেলা, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ.৬১

*****